সাঁওতাল জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

এক

শুরুতেই পুরাণ মতে সাঁওতাল জাতির বাসভূমি সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক এবং এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনী চলে আসে। সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পন্ডিত গুরু কলেয়ান হাড়াম কথিত এবং L..O. Skrefsrud লিখিত একখানি মূল্যবান গ্রন্থ ১৮৮৭ সালে তৎকালীন বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা জেলার বেনাগেড়িয়া মিশন প্রেস থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির নাম "হড়কোরেন মারে হাপড়াম কো রেয়াঃ কাথা" (সাঁওতাল জাতির পূর্বপুরুষদের কথা)। গ্রন্থটিতে সৃষ্টিতত্ত্বের যে কাহিনী বর্ণীত হয়েছে তা এখানে উল্লেখ করা হল—

সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী ছিল জলময়। শুধুই জল। জলের তলায় ছিল মাটি। এই অনন্ত জলরাশির উপর ঠাকুর জিউ ও ঠাকরান (ঠাকুর জিউ-এর স্ত্রী) প্রতিদিন স্বর্গপুরী থেকে 'তোড়ে' সুতোতে করে নেমে এসে স্নান করতেন। যতবারই তাঁরা স্নানে আসেন ততবারই ঠাকুর জিউ কোন না কোন জলচর প্রাণী সৃষ্টি করতেন। এ ভাবেই একের পর এক সৃষ্টি করেন—কাঁকড়া, কুমীর, চিংড়িমাছ, রাঘব বোয়াল, কেঁচো, কচ্ছপ প্রভৃতি। জলচর প্রাণী সৃষ্টির পর ঠাকুর জিউ মানব সৃষ্টির জন্য মনস্থ করেন। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। মাটি দিয়ে তিনি দুটো মানবমূর্তি তৈরি করেন। কিন্তু দুটোতে প্রাণদানের সময় আকাশ থেকে 'সিঞসাদম' বা সূর্যঘোড়া নেমে এসে মূর্তি দুটোকে পা দিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। পরিশ্রম ও মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় ঠাকুর জিউ খুব দুঃখ পান এবং স্থির করেন যে তিনি আর মানব সৃষ্টি করবেন না।

কিন্তু সেই দুঃখ ভুলে একদিন স্নানের সময় ঠাকুর জিউ নিজের বুকের ময়লা ঘসে ঘসে বের করে তা একত্র করেন এবং এই ময়লা দিয়ে দুটি পাখি তৈরি করেন। একটি পুরুষ ও অন্যটি স্ত্রী। পুরুষ পাখিটির নাম হয় 'হাঁস' ও স্ত্রী পাখিটির নাম হয় 'হাঁসিল'। পাখি দুটি দেখতে সুন্দর হওয়ায় ঠাকুর খুব খুশী। এরপর তিনি ফুঁ দিয়ে পাখি দুটির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেন। পাখি দুটি প্রাণ পেয়ে আকশে উড়ে গেল এবং উড়ে উড়েই বেড়াতে লাগল। চারদিকে অথৈ জল। কোথাও বসার জায়গা নেই।

তাই শেষ পর্যন্ত পাখি দুটি ঠাকুরের হাতে উড়ে এসে বসল।

এই সময়ে স্বর্গপুরী থেকে 'সিঞসাদম' বা সূর্যঘোড়া জলপানের জন্য নিচে নেমে এল। জলপান করার সময় তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হয় এবং সেই ফেনা জলে ভাসতে লাগল। ঠাকুর জিউ তখন পাখি দুটিকে ঐ ভাসমান ফেনার উপর আশ্রয় নিতে বলেন। ঠাকুরের কথা মতো পাখি দুটি অর্থাৎ হাঁস ও হাঁসিল ফেনার উপর আশ্রয় নেয়। ভাসমান ফেনা সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে লাগল। ফেনার সাথে সাথে হাঁস-হাঁসিলও স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে থাকে। এ ভাবে ঘুরে বেড়ানোতে আনন্দ থাকলেও খাদ্যাভাব সব আনন্দকে নিরানন্দ করে দেয় এবং এ ভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত হাঁস হাঁসিল খাদ্যাভাবের কারণে ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়। ঠাকুর মহাসমুদ্রে স্থলভূমির প্রয়োজন অনুভব করেন।

তখন তাঁর সৃষ্ট জীবগুলির মধ্যে বোয়ালমাছ, কুমীর, চিংড়িমাছ ও কাঁকড়া-কে জলময় পৃথিবীর তলা থেকে মাটি তুলে আনবার আদেশ দিলেন। অনেক চেষ্টা করেও কেউই মাটি তুলে আনতে পারল না কারণ তুলে আনবার সময় সমস্ত মাটি জলে গলে যাচ্ছিল। ঠাকুর ভাবনায় পড়লেন। শেষে ঠাকুর কেঁচোকে মাটি তুলবার আদেশ দিলেন। কেঁচো শর্ত সাপেক্ষে মাটি তুলে আনার জন্য রাজি হয়। শর্ত হল, কচ্ছপকে জলের উপর ভেসে থাকতে হবে। ঠাকুর কেঁচোর শর্ত মেনে নিলেন এবং কচ্ছপকে ডেকে জলের উপর স্থির হয়ে ভেসে থাকার নির্দেশ দেন। কচ্ছপ তা-ই করল। তার চারটি পায়ের মধ্যে তিনটি পা শিকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল।

কেঁচো তখন কচ্ছপের পিঠের উপর লেজ রেখে, জলের নিচে গিয়ে মাটি খেতে শুরু করে। সেই মাটি কেঁচোর শরীর বরাবর এসে মলের আকারে কচ্ছপের পিঠে বের হয় এবং জমা হতে থাকে। এই পদ্ধতি ক্রমাগত চলতে থাকায় পৃথিবী মাটিতে ভরে গেল। তখন কেঁচো মাটি তোলা বন্ধ করে। ঠাকুর তখন মই দিয়ে মাটি সমান করে দিলেন। যে সব অংশ ঢিবির মত উঁচু রইল তা পাহাড় হল। এরপর ঠাকুর সমতল মাটিতে 'শিরম' ঘাসের বীজ বুনলেন, তারপর বুনলেন দূর্বাঘাস। পৃথিবীর মাটি ক্রমশ শক্ত হতে থাকে। শক্ত মাটিতে ঠাকুর পরপর করম গাছ, শাল গাছ, মহুয়াগাছ, কেঁদু গাছ ইত্যাদি গাছপালা সৃষ্টি করলেন। হাঁস-হাঁসিল পাখি দুটি 'শিরম' ঘাসের ঝোপে বাসা বাঁধল।

একদিন হাঁসিল এখানেই দুটি ডিম পাড়ে। নির্দিষ্ট সময়ে ডিম থেকে দুটি মানব শিশুর জন্ম হয়। একটি ছেলে ও অন্যটি মেয়ে। মানবশিশু দুটির জন্ম হলে পর তাদের কোথায় রাখা হবে, কি খাওয়ানো হবে—এসব চিন্তা করে হাঁস-হাঁসিল বিলাপসূচক গান গায়—

হায় হায় জালাপুরীরে
হায় হায় নুকিন মানওয়া
হায় হায় বুঁসাড় আকানকিন
হায় হায় তোকারে দহকিন?
হায় হায় দো সে লাই আয়বেন
হায় হায় মারাং ঠাকুর জীউ
হায় হায় নুকিন মানওয়া
হায় হায় তোকারে দহকিন?

গানটির বঙ্গানুবাদ শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বাসকে এভাবে করেছেন—

হায় হায় মহাসাগরে
হায় হায় এই মানুষ দুটি
হায় হায় জন্মলাভ করেছে
হায় হায় দাও বলে দাও
হায় হায় মহান ঠাকুর জীউ
হায় হায় এই মানব শিশু দুটিকে
হায় হায় কোথায় এখন রাখব?

হিহিড়ি পিপিড়ি :

হাঁস-হাঁসিল-এর এই করুণ মিনতির উত্তরে ঠাকুর জীউ হাঁস-হাঁসিলকে জানান, যাও তোমরা উড়ে উড়ে এই দুটি মানব শিশুর জন্য স্থান নির্বাচন কর। নির্দেশ পেয়েই তারা পশ্চিমদিকে উড়ে যায় এবং একটি স্থান নির্বাচন করে। এই স্থানের নাম হিহিড়ি পিপিড়ি। হাঁস-হাঁসিল ফিরে এসে ঠাকুরকে হিহিড়ি পিপিড়ি-র কথা জানাতেই ঠাকুর মানব শিশুদ্বয়কে ওখানে নিয়ে যাবার কথা জানায়। তখন হাঁস-হাঁসিল পিঠে করে শিশু দুটিকে হিহিড়ি পিপিড়িতে নিয়ে আসে। এই হিহিড়ি পিপিড়িই হল প্রথম বাসভূমি।

মানব শিশু দুটিকে এখানে রেখে হাঁস-হাঁসিল যে কোথায় গেল তা আর জানা যায় না। মানব শিশু দুটির একটি ছেলে, অপরটি মেয়ে।

পুরাণ অনুযায়ী এরাই সাঁওতাল জাতির আদি পিতামাতা-পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি। ঠাকুরের বার্তাবাহক লিটার উপর মানব শিশুদুটির দেখাশুনা করার ভার পড়ল। শিশুদুটি 'সুমতু বুকুচ' নামক ঘাস ও শ্যামা ঘাসের দানা খেয়ে বড় হতে লাগল। ক্রমশ যৌবন প্রাপ্ত হয়। তথাপি এরা উলঙ্গ থাকত কেননা লজ্জা বোধ না থাকায় তারা আবরণের প্রয়োজন অনুভব করে নি। একদিন লিটা তাদের হাঁড়িয়া

তৈরী করতে শেখালেন। তাদের এও বললেন, হাঁড়িয়া খাওয়ার আগে তাঁকে (লিটাকে) যেন সামান্য উৎসর্গ করা হয়। পিলচু হাড়াম পিলচু বুড়হি হাঁড়িয়া তৈরি করল, লিটার নামে উৎসর্গ করল এবং নিজেরা খেয়ে নেশাগ্রস্ত হল। সেই রাতেই তারা পরস্পর দৈহিক ভাবে প্রথম মিলিত হয়।

পরের দিন সকাল। লিটার ডাকাডাকিতে সাড়া দিলেও তারা সামনে আসতে পারছে না। কেননা লজ্জাবোধ তাদের পেয়ে বসেছে। ঘরের ভিতর থেকেই তারা লিটাকে জানায়,—আমরা কি করে বেরোব? আমাদের শরীরে কোন আবরণ নেই, আমাদের বড়ই লজ্জা করছে। তাছাড়া গত রাতে হাঁড়িয়া খেয়ে আমরা খারাপ কাজ করেছি।

এ সব অবশ্য লিটার জানা কেননা তাঁরই পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ঘটেছে। পিলচু হাড়াম-পিলচু বুড়হিকে আশ্বস্ত করার জন্য লিটা জানায়,—তাতে আর কি হয়েছে, ওতো ঠিকই হয়েছে। তারপর লিটা স্বয়ং তাদের লজ্জা নিবারণের জন্য বটগাছের পাতা এনে দিলেন। তারা সেই পাতা সেলাই করে এবং পরে নিয়ে লিটার সামনে আসে।

কালক্রমে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হির সন্তান-সন্ততি হয়। সাত ছেলে ও সাত মেয়ে। ছেলেদের নাম হল—সান্তরা, সানতম, চারে, মানে, আচারে দেলহু ও বাকী দুজনের নাম জানা যায় না।

মেয়েরা হল ছিতা, কাপু, হিঁসি, ডুমনী ও বাকি তিনজনের নাম জানা যায় না। মুখ্য দেবতা মারাং বুরু এই সব ছেলে মেয়েদের খেরওয়াড় জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেন। ছেলেমেয়েরা ক্রমশ বড় হতে থাকে। তারপর একসময় তারা যৌবনে পদার্পণ করে। একদিন পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি আলোচনা করে ঠিক করে যে, বংশবৃদ্ধির কারণে এদের পারস্পরিক বিয়ে দেওয়া প্রয়োজন এবং এ কারণেই এদের একত্রে একই স্থানে রাখা যাবে না। তারা ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য পৃথক জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে যাতে এদের কারোর মধ্যে যেন দেখা সাক্ষাৎ না হয়। পিলচু হাড়াম ছেলেদের নিয়ে প্রায়ই শিকারে যেত। এ ভাবেই একদিন ছেলেরা শিকার করতে যায় 'খান্ডেরায়' জঙ্গলে। অন্যদিকে মেয়েরা 'সুঁড়ুকুচ' বনে যায় শাকপাতা তুলতে। ঘটনাচক্রে ছেলে মেয়েদের সাক্ষাৎ হয় 'চাঁপাকিয়া' বটবৃক্ষের তলায়। ঠাকুরের লীলায় কেউ কাউকে চিনতে পারে না। ফলে নাচ গানের মাধ্যমে তাদের মধ্যে মন দেওয়া নেওয়া হয়। বড় ভাই পছন্দ করে নেয় বড় বোনকে, মেজভাই মেজবোনকে, এভাবেই ছোট ভাই ছোট বোনকে পছন্দ করে। তারা পরস্পর পরস্পরের প্রেমে পড়ে। একথা জেনে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি তাদের বিয়ে দেওয়া স্থির করে এবং সাত জনের জন্য সাতটি ঘর তৈরি করে। অবশেষে বিয়ে হয়।

কালক্রমে সকলের সন্তান হয়। পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি নাতি নাতনীদের দেখে বেশ চিন্তায় পড়ে। একবার তারা ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ে দিয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে আর যাতে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য ছেলেমেয়েদের ভিন্ন গোত্রে নামকরণ করে দেয় এবং তাদের মধ্যে পদবীও তারা চিহ্নিত করে দেয়, যেমন—হাঁসদা, মুরমু, কিস্কু, হেমব্রম, মান্ডি, সরেন ও টুডু। পিলচু হাড়াম পিলচু বুড়হি নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেয় যে, একই গোত্রের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আর কখনই বিবাহ দেওয়া যাবে না। বিবাহ সবসময় দুটি আলাদা আলাদা গোত্রের ছেলেমেয়েদের মধ্যে হবে।

খজকামান

হিহিড়ি পিপিড়িতে ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি হতে থাকায় তাদের মধ্যে জনসংখ্যা বেড়ে যায়। এমন সময়ে তারা হিহিড়ি পিপিড়ি পরিত্যাগ করে চলে আসে খজকামান নামক জায়গায়। বহুদিন তারা এখানে বসবাস করে। এখানে থাকাকালীন এদের মধ্যে চারিত্রিক দোষ বেড়ে যায়। ফলে ঠাকুরও তাদের উপর ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং সবাইকে তাঁর শরণাপন্ন হতে বলেন কিন্তু নানা দোষে লিপ্ত থাকার কারণে ঠাকুরের কথায় কেউ কর্ণপাত করে নি।

হারাতা

ঠাকুরের কথাকে অবহেলা করায় তিনি ভীষণ রুষ্ট হন এবং সকলের প্রাণনাশের সঙ্কল্প করেন। কেবলমাত্র একজোড়া স্বামী-স্ত্রীকে ডেকে ঠাকুর তাদের হারাতা নামক জায়গায় নিয়ে যান এবং এখানকার এক গুহায় প্রবেশের জন্য তাদের আদেশ দেন। ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী হারাতা পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে। ওদিকে ঠাকুর খজকামানে সাতদিন সাতরাত ধরে অগ্নিবৃষ্টি করেন। ফলতঃ মানব ও জীবজন্তুর দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেবলমাত্র বেঁচে রইল হারাতা পাহাড়ের গুহায় থাকা দুই মানব। নর ও নারী। স্বামী ও স্ত্রী। ঠাকুরের নির্দেশ পেয়ে তারা গুহার বাইরে এসে বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে এদের সন্তান সন্ততি হয়। বংশবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। হারাতায় এরা বহুদিন বসবাস করে।

[কারোর কারোর মতে একজোড়া স্বামী-স্ত্রী যারা ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী হারাতা পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে প্রাণে বেঁচেছিল তারা আসলে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি।

আবার কারোর মতে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়হি হিহিড়ি পিপিড়িতেই

দেহত্যাগ করে। কারোর মতে, সাত ভাই বোনে সাত জোড়া স্বামী-স্ত্রী। এদের মধ্যে একজোড়াকে ঠাকুর গুহায় প্রবেশের আদেশ দেন। তবে কোন জোড়া স্বামী-স্ত্রী তা জানা যায় না।]

সাসাংবেডা

হারাতায় বহুদিন বসবাসের পর তারা চলে আসে সাসাংবেডা নামক জায়গায়। জায়গাটি জুড়ে বিস্তীর্ণ ভূখন্ড। বন ও পাহাড় তুলনামূলক ভাবে এখানে কম। এখানে অবস্থানকালীন এরা পুনরায় 'জাতি' হিসেবে পরিচিত হয়। খেরওয়াড় জাতি। গোত্র নামকরণের প্রথা মতো (পূর্বপুরুষের নামে নামকরণ) এদের সন্তান সন্ততিদের পদবী দেওয়া হল ঠিক আগের মতোই অর্থাৎ হিহিড়ি পিপিড়িতে থাকাকালীন যেমনটি হয়েছিল। যেমন—হাঁসদা, মুরমু, কিস্কু, হেমব্রম, মান্ডি (মারান্ডি/মারডি) সরেন ও টুডু। সাসাংবেডায় থাকাকালীন এদের মধ্যে পুনরায় গোত্র বিভাজন হয় এবং সাতটি পদবী ছাড়া আরো পাঁচটি পদবী যুক্ত হয়। এগুলি হল—বাসকে, বেসরা, পাউরিয়া, চঁড়ে ও বেদেয়া। প্রাসঙ্গিক ভাবে এখানে একটি প্রচলিত গানের উল্লেখ করা হল—

"হিহিড়ি পিপিড়িরে বন জানামলেন
খজকামানরে বন খজলেন
হারাতারে বোন হারালেন
সাসাংবেডারে বন জাত এ্যনা হো।"

অর্থাৎ : হিহিড়ি পিপিড়িতে আমাদের জন্ম হয়েছে, খজকামানে খোঁজ হয়েছে। হারাতাতে আমরা বেড়ে উঠেছি। সাসাংবেডাতে জাতি পেয়েছি বা জাতি বিভাজন হয়েছি।

জারপি দিশম

সাসাংবেডা থেকে এরা চলে আসে 'জারপি দিশম' নামক জায়গায়। দিশম অর্থে দেশ বা অঞ্চল। জারপি দিশমে দীর্ঘদিন থাকার পর কোন এক অজানা কারণে তারা এখানে টিকতে পারল না। ফলে জারপি দিশম ছেড়ে তারা অন্যত্র চলে যায়।

আইরে দিশম

জারপি দিশম ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় জঙ্গলের রাস্তায় তারা একটি বিশাল উঁচু পাহাড়ের মুখোমুখি হয়। পাহাড় অতিক্রম করার রাস্তাও নেই। এমন সময়ে তারা সবাই মিলে মুখ্যদেবতা মারাং বুরুর শরণাপন্ন হয়। ফলে আশ্চর্য ভাবে তারা পাহাড়

অতিক্রম করার পথ খুঁজে পায়। সেই পথ ধরে পাহাড় অতিক্রম করতেই তারা দেখতে পায় মনোরম সূর্যোদয়ের দৃশ্য। যে পথ বেয়ে তারা পাহাড় অতিক্রম করতে সক্ষম হয় সেই পথকে বলা হয় 'সিঞদুয়ার' বা সিঞদরজা। 'সিঞদুয়ার' বা সিঞ্ দরজার পথ ধরে পূর্বপুরুষরা পাহাড় অতিক্রম করার পর তারা আরো একটি পথ বা দরজার মুখোমুখি হয়। এই দরজা বা পথের নাম 'বাইদুয়ার' বা বাই দরজা। এই পথ ধরে তারা আসে 'আইরে দিশম' নামক জায়গায়। এখানে তারা বহুদিন বসবাস করে।

কায়েন্ডা দিশম

আইরে দিশমে দীর্ঘদিন বসবাসের পর তারা চলে আসে 'কায়েন্ডা দিশম' নামক জায়গায়। খেরওয়াল তথা সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা এখানেও বহুদিন ধরে বসবাস করে।

চায় দিশম

কায়েন্ডা দিশমে তারা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারল না। কোন এক অজানা কারণে এই অঞ্চল ছেড়ে তারা 'চায় দিশম' নামক জায়গায় বা অঞ্চলে গিয়ে বসবাস শুরু করে। এখানে এদের জনসংখ্যা বিপুল বৃদ্ধি পায়।

চাম্পা দিশম

চায় দিশম নামক জায়গায় তারা থাকতে না পেরে চলে যায় সপ্তনদীর দেশ বা অঞ্চল 'চাম্পা দিশম' নামক জায়গায়। 'চাম্পা দিশমে' প্রবেশ ও নির্গমনের জন্য দুটি দরজা ছিল। একটি হল 'চায় দুয়ার' বা চায় দরজা, অপরটি হল 'চাম্পা দুয়ার' বা চাম্পা দরজা। এখানে তারা বহু বছর পরম সুখে শান্তিতে বসবাস করে। এখানে এদের কোন কিছুরই অভাব ছিল না। এই চাম্পা দিশমে থাকাকালীনই বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল। যেমন—কিস্কু গোষ্ঠীর উপর দেশ শাসনের ভার, হেমব্রম গোষ্ঠীর উপর শলা পরামর্শ দেওয়ার ভার, সরেন গোষ্ঠীর উপর দেশ রক্ষার ভার, মুরমু গোষ্ঠীর উপর পূজার্চনার ভার, মান্ডী গোষ্ঠীর উপর কৃষিকাজের ভার, বাসকে গোষ্ঠীর উপর ব্যবসা বাণিজ্যের ভার এবং টুডু গোষ্ঠীর উপর পড়েছিল বিনোদনের ভার।

চাম্পা দিশম বা চাম্পা দেশে তারা নিজস্ব সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। শত্রুর হাত থেকে নিজস্ব সভ্যতাকে রক্ষা করবার জন্য তারা গড়ে তুলেছিল বারোটি গাড় (গড়)

বা দুর্গ/কেল্লা। যেমন—

(১) কুটাম পুরিগাড়। এটি হাঁসদা গোষ্ঠীর।
(২) কঁয়ডা গাড়। এটি কিস্কু গোষ্ঠীর।
(৩) চাম্পা গাড়। এটি মুরমু গোষ্ঠীর।
(৪) খায়রি গাড়। এটি হেমব্রম গোষ্ঠীর।
(৫) বাদোলী গাড়। এটি মান্ডি গোষ্ঠীর।
(৬) চায় গাড় বা চায় বাহের গাড়। এটি সরেন গোষ্ঠীর।
(৭) সিম গাড়। এটি টুডু গোষ্ঠীর।
(৮) হারবালেয়াং গাড়। এটি বাসকে গোষ্ঠীর।
(৯) বানসারিয়া গাড়। এটি বেসরা গোষ্ঠীর।
(১০) জাঙ্গে কোডে গাড়। এটি চঁড়ে গোষ্ঠীর।
(১১) বামা গাড়। এটি পাউরিয়া গোষ্ঠীর।
(১২) হলং গাডা গাড়। বেদেয়া বা সোয়ালী গোষ্ঠীর।

চাম্পা দেশে থাকাকালীনই খেরওয়াড়রা মারাংবুরু, জাহের এরা এবং মড়েক-তুরুইক দেবদেবীর জন্য গ্রাম প্রান্তে জাহের থান বা পূজার্চনার জন্য পবিত্র স্থান প্রতিষ্ঠা করে। এই দেশে অবস্থানকালীনই অন্যদের (অ-খেরওয়াড়) সঙ্গে তাদের ভালো সম্পর্ক ছিল, পরে অবশ্য তাতে ফাটল ধরে। ফাটল এত গভীর হয় যে, যুদ্ধ ছাড়া উপায় ছিল না। তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তাতে খেরওয়াড়রা হেরে যায়। চাম্পাগাড় অ-খেরওয়াড়রা অধিকার করে নেয়। পরে অবশ্য পুনরায় যুদ্ধ করে খেরওয়াড়রা চাম্পাগাড় পুনরুদ্ধার করে। চাম্পা দিশম পর্যন্ত থাকাকালীনই খেরওয়াড় গোষ্ঠীর জনগোষ্ঠী একত্রে বসবাস করে। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল মুন্ডা, বিরহড়, কুড়মি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষ। মুন্ডারা খেরওয়াড় থেকে আলাদা হল। কুড়মিরা অ-খেরওয়াড় বা দেকো/দিকুদের মধ্যে মিশে গেল। খেরওয়াড়দের মধ্যে কেউ কেউ অ-খেরওয়াড় 'সিং' পদবীধারীদের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তারাও 'সিং' হয়ে গেল। খেরওয়াড় গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র সাঁওতালরাই চাম্পাদেশে রইল। তারাই প্রকৃতপক্ষে এখনও খেরওয়াড় পরিচিতি বহন করে চলেছে।

দীর্ঘকাল বসবাস করার পর শেষ পর্যন্ত সাঁওতালরাও চাম্পাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর তিনটি কারণ রয়েছে—

(১) গৃহবিবাদ
(২) অরাজকতা ও অশান্তি
(৩) মাধো সিং

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাধো সিং ছিল কিস্কু রাজার দেওয়ান। সে একজন সাঁওতাল মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে সমস্যার উদ্ভব হয় কারণ মাধো সিং অন্য সম্প্রদায়ের লোক। তার জন্ম বৃত্তান্ত কেউ জানে না। মান্ডি বংশের কেউ একজন তাকে জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনে ও প্রতিপালন করে। বড় হয়ে মাধো সিং নিজস্ব মেধার জোরে কিস্কু রাজার দেওয়ান পদে আসীন হয়। এহেন মাধো সিং সাঁওতাল মেয়েকে বিয়ে করতে চায় শুনে সাঁওতালরা দুশ্চিন্তায় পড়ে কেননা মাধো সিং বিজাতির লোক। কেউই তাকে মেয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ মাধো সিং সমস্ত সাঁওতাল মেয়েদের সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে তাদের ইজ্জত নষ্ট করতে চাইল। একথা শুনে যাদের বাড়ীতে বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল তারা সবাই রাতের অন্ধকারে বিষয় সম্পত্তি নিয়ে চায় চাম্পা দিশম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়।

তোড়ে পুখুরি বাহা বান্দেলা

চাম্পাদেশ ত্যাগ করে সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা 'তোড়ে পুখুরি বাহা বান্দেলা' নামক জায়গায় চলে আসে। এখানেও তারা দীর্ঘদিন বসবাস করে। এখানে থাকাকালীনই 'তোপে সারজম' (বৃক্ষ বিশেষ), 'লাবাড় আতনাঃ' (বৃক্ষবিশেষ), লাডেয়া মাতকম (বৃক্ষবিশেষ) বৃক্ষের তলায় পদ্মপাতা বিছানো আসনে বসে 'কেরেডোডি' নামক ঝরণার জল খেয়ে বারো বছর ধরে শলা পরামর্শ ও বিচার বিবেচনা করার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত রকমের সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম করার জন্য তারা এভাবেই একত্রে বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, এখনও এই ধারা অনুসৃত হয়। যাই হোক, এই দেশে বা অঞ্চলে অ-সাঁওতাল বা অ-খেরওয়াড়দের অনুপ্রবেশ ক্রমশ বাড়তে থাকায় তারা স্থান পরিবর্তন করে।

ইচাঃ বুটী-মাতকম বুটী

তোড়ে পুখুরি বাহা বান্দেলা থেকে চলে আসার সময় তারা দুটি দলে ভাগ হয়। একটি দল পুরুষদের। অন্যটি মহিলাদের। পুরুষদলটি চলে আসে 'ইচাঃ বুটী' নামক জায়গায়। অন্যদিকে মহিলাদলটি চলে আসে 'মাতকম বুটী' নামক জায়গায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'তোড়ে পুখুরি বাহা বান্দেলা' কেবলমাত্র স্থান নাম নয়। এটি একটি বিশাল জলাশয়েরও নাম। এই বিশাল জলাশয় পেরিয়ে তবেই তারা 'ইচাঃ বুটী মাতকম বুটী' জায়গায় এসে পৌঁছয়। আরো উল্লেখ্য, এই বিশাল জলাশয় পরিপূর্ণ ছিল পদ্মপাতায় এবং পূর্বপুরুষরা পদ্মপাতার উপর দিয়ে হেঁটে জলাশয় পার হয়।

আশ্চর্য, তাদের পা এতটুকুও ভেজে নি বা পদ্মপাতাও ছিঁড়ে যায় নি। এই অদ্ভুত ঘটনার পর তারা পুনরায় সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের পূর্বসিদ্ধান্ত যা কিনা 'তোড়ে পুখুরি বাহা বান্দেলা'-য় থাকাকালীন 'তোপে সারজম' 'লাবড় আতনাঃ' 'লাডেয়া মাতকম' নামক গাছগুলোর তলায় বসে গ্রহণ করেছিল, তা সব অর্থেই সঠিক এবং এভাবেই তারা যুগ যুগ ধরে কেবলমাত্র বিচার বিবেচনার মাধ্যমেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। 'ইচাঃ বুটী-মাতকম বুটী' স্থানেও তারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে।

জনা জস্‌পুর

'ইচাঃ বুটী-মাতকম বুটী' স্থানে থাকাকালীন তারা লক্ষ্য করল যে, এখানেও ক্রমশ 'দেকো'দের প্রবেশ ঘটছে। এই 'দেকো'-রা হচ্ছে তুড়ুক বা মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক। এদের ভয়েই তারা 'ইচাঃ বুটী-মাতকম বুটী' ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। নতুন ঠিকানার খোঁজে যাবার সময় 'বাঁরি বাডওয়া' নামক গভীর অরণ্যের সামনে তারা আসে। কেউই আর এগোতে চায় না। ফলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, তারা পরস্পর হাত ধরাধরি করে একত্রে জঙ্গল অতিক্রম করবে এবং তারা তা-ই করল।

জঙ্গল অতিক্রম করে তারা এসে পৌঁছয় 'জনা জসপুর' নামক স্থানে। এই জায়গা বা অঞ্চলটি বেশ খোলামেলা। এখানে তারা বসতি গড়ে তোলে এবং বহুকাল ধরে বসবাস করে।

ঘাসপাল বেলাওংজা

জনা জস্‌পুরেও কোন এক অজানা কারণে দীর্ঘস্থায়ী হতে না পারায় তারা স্থান ত্যাগ করে চলে আসে 'ঘাসপাল বেলাওংজা' নামক জায়গায়। এখানে থাকাকালীনই তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং খেরওয়াড় নাম অব্যবহৃত হতে থাকায় হারিয়ে যেতে থাকে।

শিরদিশম

'ঘাসপাল বেলাওংজা'তে থাকাকালীন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া দলেরই এক অংশ চলে আসে 'শিরদিশম' নামক জায়গায়। বিচ্ছিন্ন দলটি এখানে বহুকাল ধরে বসবাস করে।

শিখীর দিশম

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া দলের আরেকটি অংশ চলে আসে 'শিখীর দিশম' নামক

জায়গায়। এখানে জঙ্গল পরিষ্কার করে শিখীর রাজার অধীনে বসবাস শুরু করে। কালক্রমে তারা 'দেকো' দের দ্বারা এই অঞ্চল থেকেও বিতাড়িত হয়।

শিখীর দিশম বা শিখীর ভূমের প্রথম পারগানা (পরগণার অধিকর্তা) ছিলেন হিকিম পারগানা। এই সময়ে অঞ্চলটি ছিল গভীর জঙ্গলে ভরা। এরকমই দুটি বন বা জঙ্গল ছিল এই দেশে। সেই বন দুটির একটির নাম হল—'সিঞবির' (সিঞবন) এবং অপরটির নাম 'মানবির' (মানবন)। হিকিম পারগানার আদেশ অনুযায়ী বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বসতভূমি তৈরী করা হয়। বহুযুগ ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে তারা তাদের সামাজিক, ধর্মীয় রীতিনীতি, নিয়ম কানুন সবই প্রায় ভুলে গিয়েছিল। শিখীর দিশমে আসার পর তারা আবার নতুন করে সব কিছু চালু করে। বাড়ীঘর তৈরী করে আবার স্বাভাবিক ও সামাজিক জীবনযাত্রা তারা শুরু করে।

অনেকে বলেন, এই অঞ্চলের দুটি বন বা জঙ্গল 'সিঞবির' ও 'মানবির'ই পরবর্তীকালে সিংভূম ও মানভূমে পরিবর্তিত হয়।

নাগপুর

শিখীর দিশমে সুখশান্তির জীবনযাত্রা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই রাজার অধীনে থাকতে অস্বীকার করে কেননা তারা স্বাধীন ভাবে বসবাসে অভ্যস্থ। এই অনিচ্ছুকদেরই একটি দল শিখীর দিশম ছেড়ে চলে আসে নাগপুর অঞ্চলে। এখানে স্থায়ী ভাবে তারা বসবাস শুরু করে।

সাঁত্ দিশম

'ঘাসপাল বেলাওংজা'তে থাকাকালীন খেরওয়ার গোষ্ঠীর মানুষজনদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া দলের একটি অংশ যেমন শিখীর দিশমে এসে বসবাস শুরু করে তেমনি আরেকটি দল শিখীর দিশম অতিক্রম করে চলে আসে 'সাঁত দিশম' নামক জায়গায়। এখানে এরা বহুকাল ধরে বসবাস করে। এখানে থাকাকালীন এদের 'সান্তাল' বা 'সাঁওতাল' (সান্তাড়) নামকরণ করা হয়।

টুঁডি দিশম

শিখীর দিশমে থাকাকালীম 'দেকো' দের উৎপাত যেমন দেখা দিয়েছিল তেমনি অন্যদিকে ছিল রাজার অধীনস্থ হওয়া। এই দুয়ের কারণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে একদল

যেমন 'নাগপুর' অঞ্চলে চলে যায় তেমনি আরেকটি দল আসে 'টুঁডি দিশম' নামক জায়গায়। এখানে তারা বেশ কিছুকাল বসবাস করে।

সাঁওতাড় পারগানা

'টুঁডি দিশম' নামক জায়গায় থাকাকালীন একটা ভয় তাদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল এবং তা হল মুসলমানদের প্রতি ভয়। যে কারণে অজয় নদীর ওপারে তাদের যাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু অভাবজনিত যন্ত্রণার কাছে কোন বারণই বারণ নয়, কোন বাধাই নয়। তাই দেখা গেল, অভাবের তাড়নায় সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরা অজয় নদী পেরিয়ে ক্রমশ 'সাঁওতাড় পারগানা' (সান্তাল পরগণা) নামক জায়গায় বসতি স্থাপন করে। সেই থেকে আজো এই অঞ্চলে সাঁওতালদের ঘন বসতি রয়েছে।

এতক্ষণ 'হড়কোরেন মারে হাপড়াম কো রেয়াঃ কাথা' গ্রন্থে বর্ণিত সাঁওতালদের বাসভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এছাড়াও আরো কিছু দিশম বা অঞ্চলের কথা এখনও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষদের কথায় ও গানে প্রচলিত রয়েছে। এগুলির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

শিকীর দিশম

এটি হল পুরুলিয়া জেলার সাতুড়ি থানা অঞ্চল। পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা এবং পুরুলিয়া ও সাঁওতাল পরগণার সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলকে বলা হয় শিকীর দিশম।

সাঁত দিশম

কেউ বলেন এটি বাঁকুড়া জেলার ছাতনা অঞ্চল। আবার কেউ কেউ বলেন মেদিনীপুর (বর্তমানে পশ্চিম) জেলার শিলদা অঞ্চলকে বলা হয় সাঁত দিশম।

তুং দিশম

এই দিশম বা অঞ্চলের দুটি ভাগ। মারাং তুং (বড় তুং) ও হুডিঞ তুং (ছোট তুং)।

মারাং তুং (বড় তুং) : বাঁকুড়া জেলার ফুলকুসমা অঞ্চলকে মারাং তুং (বড় তুং) বলা হয়। এর একদিকে রাইপুর অঞ্চল ও অপরদিকে মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলার শিলদা অঞ্চল।

হুডিঞ তুং (ছোট তুং) : বাঁকুড়া জেলার রাইপুর অঞ্চলকে বলা হয় 'হুডিঞ তুং' বা ছোট তুং।

ধাড়দিশম

এরও দুটি ভাগ—(১) খাতড়া ধাড় (২) দামপাড়া ধাড়।

খাতড়া ধাড় : বাঁকুড়া জেলার খাতড়া অঞ্চলকে বলা হয় খাতড়া ধাড়।

দামপাড়া ধাড় : ঝাড়খন্ড রাজ্যের পূর্ব সিংভূম জেলার ঘাটশিলা অঞ্চলকে বলা হয় দামগাড়া ধাড়।

মল্ দিশম

(বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত তালডাংরা থেকে পূর্ব দিকে ওন্দা পর্যন্ত এবং তালডাংরা থেকে আরো দক্ষিণে মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলার ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে বলা হয় মল্ দিশম' বা মল্ অঞ্চল।)

বারহা দিশম

পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার অঞ্চলকে বলা হয় 'বারহা দিশম'।

মান্ দিশম

পুরুলিয়া জেলার মানবাজার অঞ্চলকে বলা হয় 'মান্ দিশম'।

বুগড়ী দিশম

মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলার উত্তরাংশ এবং বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণাংশ অর্থাৎ দুই জেলার এই বিস্তৃত সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলকে বলা হয় বুগড়ী দিশম।

শিলদা দিশম

মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলার শিলদা অঞ্চলকে বলা হয় 'শিলদা দিশম'। অনেকে এই অঞ্চলকে 'সাঁত অঞ্চল' বলে উল্লেখ করেছেন।

কুচুং দিশম

ঝাড়খন্ড রাজ্যের পশ্চিম সিংভূম জেলার বিস্তৃত ভূখন্ডকে বলা হয় কুচুং দিশম বা কুচুং অঞ্চল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পশ্চিম সিংভূম জেলার পশ্চিম প্রান্তকে বলা হয় কোলহান

অঞ্চল। সম্ভবতঃ জেলার পূর্ব প্রান্ত যেখানে সাঁওতাল বসতি রয়েছে, তাকে 'কুচুং দিশম' বলা হয়েছে।

ভাট দিশম

মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলার লালগড়-রামগড় অঞ্চল অর্থাৎ জঙ্গলমহল অঞ্চলকে বলা হয় ভাট দিশম।

মাতব দিশম

মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলার ঝাড়গ্রামের পশ্চিমাঞ্চলকে বলা হয় মাতব দিশম।

বারিন দিশম

দিনাজপুর জেলার পূর্ব প্রান্ত বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখন্ডকে বলা হয় বারিন দিশম।

খলাড় দিশম

মেদিনীপুর (পশ্চিম) জেলার গোপীবল্লভপুর অঞ্চলকে বলা হয় খলাড় দিশম।

তুড়ুক দিশম ও গাঁগি চাঁওরিচ দিশম

সাঁওতাল জনজাতির 'দাঁশায়' পরবের গানে জাতির ইতিহাস লুকিয়ে আছে, বলে অনেকে মনে করেন। এই উৎসবের গানে যে সমস্ত নদ নদী, স্থান নামের উল্লেখ রয়েছে সেগুলির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এখনও করা হয় নি। এগুলির ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ যথাযথ ভাবে করার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল জাতির ইতিহাস উদ্ধার সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে একটি দাঁশায় গানের উল্লেখ করা হল—

"হায়রে হায়রে
তকা দিশম ধুঁদেনা হায়রে হায়
তকা দিশম মালটেনা হায়রে হায়
দিশম দ দিশম লেলেঁগেঁৎ।
হায়রে হায়রে
তুড়ুক দিশম ধুঁদেনা হায়রে হায়
গাঁগি চাঁওরিচ মালটেনা হায়রে হায়
দিশম দ দিশম লেলেঁগেঁৎ।"

এই গানের ভাবার্থ এরকম :

হায় হায়
কোন দেশ অন্ধকার হল
কোন দেশ ধ্বংস হল।
মুসলমান দেশ অন্ধকার হল
'গাঁগি চাঁওরিচ' দেশ ধ্বংস হল।

'তুড়ুক' অর্থে কেউ কেউ 'মুসলমান'দের বুঝিয়েছেন আবার অনেকে 'তুড়ুক' শব্দে 'তুর্কী' বুঝিয়েছেন। যাই হোক, 'গাঁগি চাঁওরিচ' দেশের বা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান জানা গেলে ইতিহাসগত ভাবে ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে। এটুকু বলা যায় এই দেশে বা অঞ্চলে সাঁওতাল বা খেরওয়াড়দের বসবাস ছিল।

আর একটি দাঁশায় গান-এর উল্লেখ করা হল—

"হায়রে। হায়রে। হায়রে।
তিমিন সাঙ্গিঞ গাতিঞ গিরু নাঁই দ
তিমিন সাঙ্গিঞ গাতিঞ বাহা নাঁই দ
হায়রে। হায়রে। হায়রে।
হানে গো ঞেলঃ কান গো
হানে ঞেলঃ কান
গিরু নাঁইরেদ জুয়াক এনেচ কান
বাহা নাঁইরেদ ধুড়িক অটাং এৎ।"

গানটিতে বন্ধু বা প্রেমিক প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের দুজনের কথোপকথনের মাধ্যমে বলা হয়েছে—

আর কত দূরে গিরু নদী
আর কত দূরে বাহা নদী
ঐ তো দেখা যায়
ঐ দেখা যায়
গিরু নদীর পাড়ে যুদ্ধ হয়
বাহা নদীর পাড়ে ধুলো ওড়ে।

গানটির ব্যাখ্যা ধীরেন্দ্রনাথ বাসকে রচিত "দাঁসায় দাড়ান রেনাঃ তেতেদ্ পাঁজা" (দাঁশায় নাচের তাৎপর্য অনুসন্ধান) গ্রন্থের ৩ নং পৃষ্ঠায় এ রকম দেওয়া আছে—

"গিরু নাঁই আর বাহা নাঁই আড়েরে তুপুৎ হুয়ুঃকান হতেতে ধুড়ি অটাং অঃ কান তাঁহে, উন গাতে গাপাতেকিন হমর হালাং এৎ তাঁহে অনাগে আব হঁ নিত হাঁবিচ ইনকিনাঃ হমর হালাংগেবন তেলা আঁওয়েৎ কানা। বাংমা

আব দিকু সালাঃ তুপুৎ তুপুৎতে যেখন অনা গিরু নাই ফেড বন সবঃ সেটের এনা আর অনা গিরু নাই রেমা অগম দরয়া দাঃ চিকীতেক পারমঃ আ? উন দ গুরু হাড়াম বঙ্গা এুম কাতে গিরু নাই দাঃ এ দালকেৎ সাঁওতে অনা নাই দাঃ বার সেৎ গৎ এনা আদ অনা সুড়ুং হরতে নওয়া দিসমতে ক পারম হেচ এনা। মেনাপে—গিরু নাই দ অকা আর বাহা নাইগে বাং অকা? গিরু নাইদ হুয়ুঃ কানা 'লোহিত সাগর' আর বাহা নাই দ 'শ্বেত সাগর' ক মেতাঃ কানা। নাগাম করে অল মেনাঃ আ যে মানমি দ মিৎ ঠাঁও রেগেক জানাম লেনা, জাঁহাক মেতাঃ কানা মধ্য-এশিয়া উত্তর মেরু, তারপরে, অভেখন বঁশ ক বীড এন খান অনা ঠাঁও খন তাপাম তুপুৎ কাতে ক ছিতির বিতির এনা, মেনখান আব খেরওয়াল জাতিগে আইরে দিসম, বাইরে দিসম সেৎতে পাহিল নওয়া ভারত দিসম তেক হেচলেনা।"

ব্যাখ্যার বাংলা রূপান্তর :

গিরু নদী আর বাহা নদীর পাড়ে তুমুল লড়াই-এর কারণে ধুলো উড়ছিল, এরকম মুহূর্তে দুজন পরম আপনজন যেভাবে বিলাপসূচক কথোপকথন করেছিল, এখনও আমরা গানের মধ্য দিয়ে তাদের ঐ বিলাপ ধ্বনি করে চলেছি। সম্ভবতঃ 'দিকু'দের সঙ্গে লড়াইকালে পিছু হটতে হটতে যখন গিরু নদীর কাছে পৌঁছলাম তখন গিরু নদীতে অথৈ জল। তারা পার হবে কি করে? তখন গুরুদেব দেবতাকে স্মরণ করে গিরু নদীর জলে আঘাত করলেন। অথৈ জলরাশি দুভাগ হয়ে গেল এবং মাঝের সরু পথ দিয়ে তারা এদেশে পেরিয়ে এল। প্রশ্ন উঠবে, গিরুনদী কোনটি এবং বাহা নদীই বা কোনটি? গিরু নদী হল 'লোহিত সাগর' এবং বাহা নদী হল 'শ্বেত সাগর'। ইতিহাসে লেখা আছে যে, মানুষের জন্ম একই স্থান থেকে এবং তা হল মধ্য এশিয়া উত্তর মেরু। তারপর সেখানে বংশবৃদ্ধি হওয়ায় নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি শুরু হয় ফলে যে যেদিকে পারে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায় কিন্তু একমাত্র খেরওয়াল জাতিরাই আইরে দেশ, বাইরে দেশ-এর মধ্য দিয়ে প্রথম ভারতে প্রবেশ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গানটিতে যে দুজন পরম আপন জনের কথা বলা হয়েছে তারা বন্ধুও হতে পারে, প্রেমিক-প্রেমিকা হতে পারে আবার স্বামী-স্ত্রীও হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ গিরু হল চিনেমাটির মতো বস্তু যার রং লাল। কোন কিছুকে লাল রং করার জন্য 'গিরু'-র ব্যবহার করা হয়। কথায় কথায় যেমন বলা হয় 'রক্তের মতো লাল' তেমনি সাঁওতালিতে 'গিরু আরাঃ' কথার প্রচলন আছে অর্থ্যাৎ গিরুর মতো লাল। 'গিরু নদী' বলতে লোহিত সাগরকে বোঝানো হয়েছে। লোহিত অর্থে লাল।

লাল সাগর বা লাল নদী বা গিরুনদী। বাহা নদী। 'বাহা'-র আক্ষরিক অর্থ ফুল হলেও এখানে বাহা অর্থে বোঝানো হয়েছে পবিত্র অর্থাৎ সাদা বা শ্বেত। তাই সঙ্গত ভাবেই শ্বেত সাগর বা শ্বেত নদীকে বাহা নদী বলা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ উপরোক্ত ব্যাখ্যায় দুটি দেশের নাম পাওয়া গেল। (১) আইরে দেশ (২) বাইরে দেশ। পন্ডিতগণের কেউ কেউ আইরে দেশকে 'ইরাণ' এবং বাইরেকে 'বাহরিণ', হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ নিয়ে গভীর গবেষণার প্রয়োজন। তবে একথা ঠিক, নৃবিজ্ঞানীদের মতানুযায়ী, এক মানবগোষ্ঠী পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতে আসে।

উপরোক্ত দাঁশায় গানের ব্যাখ্যাটির সঙ্গে নৃবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। জলরাশি দুভাগ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ বাইবেলেও পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গটি ধীরেন্দ্রনাথ বাসকে রচিত 'দাঁসায় দাড়ান রেনা: তেতেদ পাঁজা' (দাঁশায় নাচের তাৎপর্য অনুসন্ধান) গ্রন্থ থেকে তুলে দেওয়া হল—

"বাইবেল থ আর একেন ধরম পুথি বাংকানা—অনা দ ইতিহাস পুথি লেকাতে হঁ লেখা গানঃ আ। অনা বাইবেল পুথিরে অল মেনা :

"আর আম দ আমাঃ ঠেঙ্গা তুলমে আর দরেয়াঁও চেতন স্যেচ তি তিয়ারতাম আর অনা দ বার হাটিঞ মে; খান ইস্রায়েল হপন কদ দরেয়াঁও তালা তালাতে ক বল চালাঃ আ রহড় অত রেগে।"

(Exodus স্যে দসার মোসে পুথি, ১৪ হাটিঞ ১৬ কালি)

মিশর দিসমরেন রাজ ফারাও আঃ নাহাচার সাহাও বাক সাহাও দাড়েয়াৎতে ইস্রায়েল হপনক যেখন মিশর দিসম খন ক ঞিরেন অর গিরুনাই ঠেন সেটের কাতে বাক পারম দাড়েয়াঃ কান, উনরে মোশি (ইংরাজীতে ঞুতুম দ মোজেস, বাংলাতে মোশি, তাহলে হড়তে কি মুসুচ?) আয়াঃ ঠেঙ্গা তিয়ারকাতে নাই দাঃ বার হাটিঞ লেদায় আর ইস্রায়েল হপনক অনা সুড়ুং হরতে গিরুনাইক পারম লেদা। নন্ডে কুকলি রাকাব: কানা—তাহলে কি ওনকো ইস্রায়েল হপনক সাঁও হড় হপন কহঁ তাঁহে কানা? ইস্রায়েল হপনক সঁগেতে নোকো হঁ কি মিশর দিসম ক ঞির বাগিলেৎ? আরহঁ মারে দাঁসায় সেরেঞ করে ঞেল ঞাম: আ—

"তকয় গুরু বলেতে
পোহো ক দক নাড়গোলেন
তকয় চেলা নুরেলতে
তড়ে সুতাম পাকাড়িক ডিঞ ডাবুরকেৎ।
ধরম গুরু বলেতে
পোহো ক দক নাড়গোলেন

ধরম চেলা নুরেলতে
তড়ে সুতাম পাকাড়িক ডিঞ ডাবুরকেৎ।"

নংকানাঃ সেরেঞ ক আঁজম লেখানগে মিশর দিসম রেয়াঃ উন জখেনাঃ ঘটনা মনে হিজুঃ আ। ফারাও রাজাঃ আমলরে নংকান ঘটনাগে মিশর দিসমরে ঘটাওলেন। অনা ঘটনা ইদি কাতেগে কি নংকানাঃ দাঁসায় সেরেঞক জড়াওলেন? বাইবেলরে অল মেনা: আ—

"আর পোহো ক দ গটা মিশর দিসম চেতানতে রাকাপ্ হেচ এনতে মিশর রেয়া: গটা সীমারে ক আঁড়গোয়েনা সাব সাবতে; ওনকো লাহারে ওনকো লেকাদ চেলে পোহোক বাক তাঁহেকানা; আর ওনকো তায়ম অনকা লেকা দ বাক হিজুঃ আ। আর গটা দিসম রেয়াঃ চেতানতেৎক দাপাল এসেৎকেৎ আ, আর দিসম দ ঞুঁৎ এনা, আর আরেলে সারেচ আকাৎ তাহেঁকান দিসম রেয়া: সানাম আড়াক্-সাকামক আর দারে রেয়া সানাম জ ক দ ক জম কেৎ আ, আর গটা মিশর দিসমরে চেৎ হাঁরিয়াড়াঃ হঁ বাং সারেচলেনা দারে করে আর' টন্ডি রেয়া: আড়াক-সাকাম করে।"

(Exodus স্যে দসার মোসে পুথি, ১০ হাটিঞ ১৪-১৫ কালি)।

আদ ঞেলঃ কানা, মিশর দিসমরে, মিৎ জখেচ যা ঘটাওলেনা দাঁসায় সেরেঞ করে অনাক ঘটনাগে উলেখ আকানা কাথাচ্ অনাক ঘটনা আতে দাঁসায় সেরেঞক জড়াও আাকানা। তাহলে বুঝাঃ কানা হড় হপনক মিৎ জখেচ্ মিশর দিসমরে ক তাঁহেকানা। ইস্রায়েল হপনক সঁগেতে নোকো হঁ মিশর দিসম ক বাগিলেদা।"

বঙ্গানুবাদ :

বাইবেল তো আর কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থ নয়, তা ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবেও বিবেচ্য। সেই বাইবেল গ্রন্থে লেখা আছে—

"এবং তুমি তোমার লাঠি-উঁচিয়ে ধর এবং সমুদ্র জলরাশির উপর হাত প্রসারিত কর এবং তাকে দু ভাগ কর। তাহলে ইস্রায়েল মানুষজন সমুদ্র জলরাশির মাঝখানের শুকনো পথ দিয়ে হেঁটে পার হবে"

(Exodus অর্থাৎ দ্বিতীয় মোসে পুথি, ১৪ খন্ড ১৬ কলি)

মিশর দেশের রাজা ফারাও এর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ইস্রায়েল মানুষজন যখন মিশর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং লোহিত সাগরের কাছে এসে তা অতিক্রম করতে পারছে না, সেই মুহূর্তে মোশি (ইংরেজী নাম মোজেস, বাংলায় মোশি, তাহলে সাঁওতালিতে কি মুসুচ?) তার লাঠি প্রসারিত করে সমুদ্র বা নদীর জলরাশিকে দু ভাগ করে দেয় এবং ইস্রায়েল মানুষজন সেই সরু পথ দিয়ে গিরু নদী অতিক্রম করে (গিরু নদী অর্থে লোহিত সাগর)। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে

কি সেইসব ইস্রায়েল মানুষজনের সঙ্গে সাঁওতাল মানুষজনও (হড় হপন) ছিল? ইস্রায়েল মানুষজনের সঙ্গে এরাও কি তাহলে মিশর দেশ থেকে পালিয়ে যায়?

আবারো পুরোনো দাঁশায় গানে পাওয়া যায়—

"কোন গুরুর আদেশে পঙ্গপালের দল নেমেছিল
কোন শিষ্যর কথায়
তড়ে সুতোতে তৈরী ফাঁদ ঢিলে ঢালা হয়
ধরম গুরুর আদেশে
পঙ্গপালের দল নেমেছিল
ধরম শিষ্যর কথায়
তড়ে সুতোতে তৈরী ফাঁদ ঢিলে ঢালা হয়।

এই ধরনের গান শুনলেই মিশর দেশের সেই সময়কার ঘটনার কথা মনে পড়ে। ফারাও রাজার আমলে এই ধরনের ঘটনা মিশর দেশে ঘটেছিল। সেই ঘটনার কথা দিয়েই কি এরকম দাঁশায় গান বাঁধা হয়েছিল? বাইবেলে লেখা আছে—

'এবং পঙ্গপালের দল সমগ্র মিশর দেশের উপর এসে মিশরের সমস্ত সীমানা পর্যন্ত ভরে গেল ক্রমশ; এর আগে এদের মতো কোন পঙ্গপালের দল ছিল না এবং পরেও এদের মতো আর কেউ আসবে না। এবং দেশের আকাশ এরা ঢেকে ফেলল এবং দেশ অন্ধকার হয়ে গেল এবং বরফ থেকে বেঁচে যাওয়া দেশের সমস্ত শাক-সবজি এবং গাছের কোথাও কোন বৃক্ষে কিংবা বাইরের লতা-গুল্মে সামান্য সবুজ পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল না।'

(Exodus অর্থাৎ দ্বিতীয় মোসে পুথি, ১০ খন্ড ১৪-১৫ কলি)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মিশর দেশে একদা যা ঘটেছিল তা-ই দাঁশায় গানে উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ সেই সমস্ত ঘটনা দিয়েই দাঁশায় গান বাঁধা হয়েছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, হড়রা (খেরওয়াড়রা) একদা মিশর দেশে বসবাস করত। ইস্রায়েল মানুষজনের সঙ্গে তারাও মিশর দেশ পরিত্যাগ করে।"

সাঁওতালদের বাসভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে আরো একটি দাঁশায় গানের উল্লেখ করা হল—

"হায় হায়। তকা দিসম দাঁড়াকেদা গুরুহো?
হায় হায়। তকা দিসম সাঙ্গারকেদা গুরু হো?
হায় হায়। ভন্ড দিসম দাঁড়াকেদাঞ চেলা হো,
হায় হায়। তুড়ুক দিসম সাঙ্গার কেদাঞ চেলা হো,
হায় হায়। ভন্ড দিসম দ চেলা হো ভন্ড গেয়া
হায় হায়। চেলা হো তুড়ুক দিসম দ বাং বোগেয়া।"